কৃষকেরা বাঁচার দাবি তুলছে

সরকার তাদের গুলি করে মারছে

মন্দসৌরের ঘটনা বিজেপি সরকারের কৃষক-দরদি মুখোশটা খুলে দিল। সরকারে যাওয়ার আগে নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় গেলে তিনি কৃষকদের উৎপাদন খরচের পঞ্চাশ শতাংশ অধিক দাম দেবেন। আজ কৃষকরা সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবি জানালে তিনি গুলি চালিয়ে তার জবাব দিচ্ছেন। মন্দসৌরে বিজেপি সরকারের পুলিশ গুলি চালিয়ে ৬ জন কৃষককে হত্যা করেছে। আহত হয়েছেন অসংখ্য।

মধ্যপ্রদেশের কৃষক বিক্ষোভ কোনও তাৎক্ষণিক ক্ষোভের কারণে নয়। এই অসন্তোষের শিকড় অনেক গভীরে। দীর্ঘদিন ধরে কৃষকদের মনে জমতে থাকা ক্ষোভের বিস্ফোরণ এই বিক্ষোভ। আর বিক্ষোভ তো শুধু মধ্যপ্রদেশের কৃষকদের নয়, সারা দেশের কৃষকরাই ক্ষোভে ফুঁসছে। ইতিমধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়েছে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, হরিয়ানা, রাজস্থান, পাঞ্জাবে। কোনও রাজ্যই বাদ নেই। সর্বত্রই কৃষকরা হাজারে হাজারে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। বাদ নেই পশ্চিমবঙ্গও। এ রাজ্যেও ধান আলু পাট উচ্ছে লঙ্কা টমেটো প্রায় সব ধরনের চাষিরাই ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত। বিক্ষোভের বারুদ জমা হচ্ছে তাদের মনেও।

কেন এমন অবস্থা? গোটা জাতিকে যারা খাদ্য জোগান, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই কৃষকরা সপরিবারে উদয়াস্ত পরিশ্রম করবেন অথচ ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে নিজেরাই অনাহারে দিন কাটাবেন, অবসাদগ্রস্ত হবেন এবং পরিশেষে আত্মহত্যা করবেন কেন? এমনও নয় যে, খুচরো বাজারে কৃষিপণ্যের দাম কম, খাদ্যদ্রব্য সস্তা। বরং উল্টো— সব কিছুই আকাশছোঁয়া। কৃষিজ পণ্যের কারবার করে, সার বীজ কীটনাশকের ব্যবসা করে হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করছে বড় বড় ব্যবসায়ী কর্পোরেট সংস্থাগুলি। কৃষকরা পড়ে থাকছে অন্ধকারে— ছেলেমেয়ের পড়াশোনা বন্ধ, স্ত্রীর চিকিৎসা হয় না, ঘরের চাল ফুটোই থেকে যায়। এ রাজ্যেও তো এ বছর সাধারণ মানুষ যখন ৪০-৫০ টাকা কেজি উচ্ছে কিনছে, তখন চাষিরা ২ টাকা কেজিতেও তা বিক্রি করতে পারছে না। কাঁচালঙ্কা ৩ টাকা কেজিতে বিক্রি করছে চাষিরা, বাজারে ৫০-৬০ টাকা। আলু চাষিরা আলু বিক্রি করছে ৩ টাকা কেজিতে। নাসিকে পিঁয়াজ চাষিরা ৫০ পয়সা, ১ টাকা কেজিতে পিঁয়াজ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। উত্তরপ্রদেশ সহ গোটা উত্তর ভারত জুড়ে আখচাষিরা ঋণের ভারে জর্জরিত। দক্ষিণ ভারতে তুলো চাষিদের দুর্দশার কথা কারও অজানা নয়। অর্থাৎ কৃষকদের সমস্যা আজ আর কোনও বিশেষ রাজ্যের সমস্যা নয়, সর্বভারতীয় চরিত্র নিয়েছে। কিন্তু এটা তো শুধু আজকের ঘটনা নয়। বছরের পর বছর, দশকের পর দশক কৃষকরা এভাবেই বঞ্চিত হয়ে চলেছেন। গত দু দশকে তিন লক্ষের বেশি কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। প্রতি তিরিশ মিনিটে একজন। কৃষিক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর এই পরিস্থিতির কারণ কী? কৃষিক্ষেত্রের মূল সমস্যাগুলি কী যে কারণে এ জিনিস ঘটে চলেছে?

তা হল, কৃষি উৎপাদনের ক্রমাগত বেড়ে চলা খরচ এবং উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য তথা লাভজনক দাম না পাওয়া। প্রথমে দেখা যাক, কৃষির খরচ লাফ দিয়ে বাড়ছে কেন।

কৃষিক্ষেত্রে মূল খরচগুলি হয় মূলত বীজ, সার, কীটনাশক এবং জলের জন্য।

ধান থেকে টমেটো প্রতিটি শস্যের ক্ষেত্রেই বীজ মানে উচ্চফলনশীল তথা হাইব্রিড (সংকর) বীজ। আগেকার মতো কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের একাংশকেই আর এখন বীজ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু ইতিমধ্যেই সরকারের পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন তথা উদারিকরণ নীতির কারণে সমস্ত সরকারি বীজ খামারগুলিই হয় বন্ধ না হয় বহুজাতিক বীজ কোম্পানির দখলে। কৃষককে বীজ কিনতে হয় বেসরকারি এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলির বেঁধে দেওয়া লাগামছাড়া চড়া দামে।

একই অবস্থা সারের ক্ষেত্রেও। কংগ্রেস এবং বিজেপি সরকারের মালিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার নীতির ফলে সরকারি সার কারখানাগুলির কবেই ইন্তেকাল হয়েছে। দেশজোড়া সারের বাজার প্রায় পুরোটাই বেসরকারি মালিক এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলির দখলে। ফার্টিলাইজার প্রাইসিং পলিসিও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণে। এ ক্ষেত্রে সরকার ভরতুকি যা দেয়, তার পুরোটাই এই সব নেপোরা খায়। ফলে লাফিয়ে লাফিয়ে

দিয়ে বেড়ে কয়েক গুণ হয়েছে সারের দাম।

কীটনাশকের ক্ষেত্রটিও সার-বীজের থেকে আলাদা কিছু নয়। পুরোটাই বহুজাতিক কোম্পানিগুলির দখলে। তাই দাম কোম্পানি যা ঠিক করে তা-ই। বলা বাহুল্য সে দাম আগুন প্রমাণ। তা ছাড়া, সার বা কীটনাশক, কোনও ক্ষেত্রেই ব্যবহার সম্পর্কিত কোনও প্রশিক্ষণ কৃষকদের দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারের নেই। ফলে এ সবের যথেচ্ছ ব্যবহারে জমির উর্বরতা এবং পরিবেশ দুটোরই ক্ষতি হচ্ছে, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর নামেই রয়েছে— বাস্তবে কারওরই কোনও ভূমিকা কৃষকদের জীবনে নেই।

উচ্চফলনশীল শস্যের চাষে বিপুল পরিমাণে জল লাগে। দেশের নদীবাঁধগুলির বেশির ভাগই ইতিমধ্যে সঠিক পরিকল্পনা ও সংস্কারের অভাবে প্রায় অকেজো। ফলে চাষিদের গভীর নলকূপের উপরই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু যেহেতু ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষির সংখ্যাই দেশে বেশি, তাই তাদের নির্ভর করতে হয় বড় চাষিদের গভীর নলকূপের উপর। ক্রমাগত বাড়তে থাকা বিদ্যুতের দাম, মালিকের লাভ প্রভৃতি মিলিয়ে এ ক্ষেত্রেও চাষির ঘাড়ে চাপে বিপুল পরিমাণ খরচের বোঝা।

এত সব খরচ করে চাষি যখন ফসল তোলে তখন সে গিয়ে পড়ে বাজারে ফড়ে এবং ব্যবসায়ী চক্রের ফাঁদে। ফসল যখন ওঠে তখন বাজারে জোগান যেহেতু বেশি থাকে, তাই তাকে অজুহাত করে ব্যবসায়ী চক্র সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকার সুযোগ নিয়ে ইচ্ছেমতো দাম নামিয়ে দেয়। অথচ চাষের এই বিপুল খরচের কখনও সবটা কখনও বেশির ভাগ অংশ কৃষক যেহেতু জোগাড় করে ঋণ থেকে, তাই দ্রুত সেই ঋণ শোধ করার জন্য তৎক্ষণাৎ অর্থের প্রয়োজনে কম দামেই বিক্রি করতে সে বাধ্য হয়। এরই নাম অভাবী বিক্রি। অথচ সেই দামে তার খরচ সংকুলান হয়ে সংসার চালানোর খরচ ওঠে না। ফলে কৃষক ঋণ শোধ করতে পারে না, হয়ে পড়ে ঋণগ্রস্ত।

প্রশ্ন ওঠে, সরকার কৃষিপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে না কেন? কেন সরকার নিজে ফসল না কিনে ফড়ে এবং ব্যবসায়ীদের মুনাফা-লালসার বলি হতে দেয়ে কোটি কোটি কৃষককে? সরকার যদি দাম বেঁধে দেয়, তবে তো আর এই মধ্যসত্ত্বভোগীরা এই ভাবে কৃষকদের বঞ্চিত করে মুনাফা লুঠতে পারে না। এই প্রশ্নের উত্তরের সাথে জড়িয়ে আছে বর্তমান পুঁজিবাদী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি। এই ব্যবস্থায় ব্যবসা করে লাভ করা আইনসঙ্গত। স্বাভাবিক ভাবেই এ ক্ষেত্রে লাভ আসে কৃষককে বঞ্চিত করে। যত দিন যাচ্ছে পুঁজিবাদ ততই সংকটগ্রস্ত হচ্ছে, তাই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং নীতিহীন হচ্ছে। ফলে কৃষক মরল না বাঁচল, ঋণে ডুবে আত্মহত্যা করল কি না, এবং সেই সংখ্যাটা প্রতি বছর লাখ ছাড়িয়ে যাচ্ছে কি না, তা দেখার দরকার মনে করে না এই ব্যবসায়ীরা। শুধু তাদের মুনাফাটা যত দূর সম্ভব বাড়াতে পারলেই হল।

কিন্তু সরকার দেখে না কেন? দেখে না তার কারণ, এই যে ফড়ে-ব্যবসায়ী-আড়তদার-হিমঘর মালিক-কালোবাজারি এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের চক্র— যারাই বর্তমানে ফসলের দামের বাড়া-কমা নিয়ন্ত্রণ করে, তা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সংগঠিত চক্র। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই এই চক্রটি সরকারের সমর্থক হয়ে পড়ে। দেখা যায়, এই চক্রের মাথারা অনেকেই শাসক দলের নানা স্তরের নেতাও। শাসক দলের খরচের, বিশেষত নির্বাচনী খরচের একটা বড় অংশের জোগান আসে এই চক্রের থেকে। সরকারি নেতামন্ত্রী এবং প্রশাসনের সাথে যোগসাজশেই তারা এই কাজ চালিয়ে যায়। ফলে এই চক্রকে উৎখাত করা দূরের কথা, ঘাঁটানোর কথাও এই সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ভোটবাজ ক্ষমতালোভী শাসকদলগুলি ভাবতে পারে না।

কৃষকরা যদি ফসলের ন্যায্য তথা লাভজনক দাম পেত তবে তাদের এমন ঋণগ্রস্ত হতে হত না, ঋণ মকুবের দাবিও তুলতে হত না। ন্যায্য দামের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তরা কৃষকরা যে ঋণ মকুবের দাবি তুলেছে, তাতে কেউ কেউ আপত্তি তুলছে এই বলে যে, তাতে নাকি বৃহৎ চাষিরাই সুবিধা পেয়ে যাবে বেশি। কেউ কেউ আরও কয়েক কদম এগিয়ে বলেছেন, এতে নাকি কৃষকদের ঋণ শোধ করার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যাবে। এঁদেরই আবার কেউ কেউ বিশেষজ্ঞ নাম নিয়ে মত দিচ্ছেন, সহায়ক মূল্য বাড়ালে, সরকার আরও বেশি ফসল কিনলে তাতে দশ শতাংশের বেশি চাষির কোনও লাভ হয় না। কারণ, ছোট কৃষকরা নিজেরা বাজার ধরতে পারে না, ফসল বিক্রি করে ফড়ে, আড়তদারকে। সহায়ক মূল্যের গুড় তারাই খেয়ে নেয়। অতএব এসবের প্রয়োজন নেই।

মাটিতে চরণ না ঠেকা এইসব তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের বাস্তব কৃষক জীবনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। ঠাণ্ডা ঘরে বসে, মোটা মাইনের চাকরি করে নিশ্চিন্ত জীবনে থেকে তাই তাঁরা এমন উদ্ভট মতামত দেন। প্রথমত, লক্ষ লক্ষ কৃষক যে নিরুপায় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন, তা তারা সত্যিই

উপলব্ধি করেন কি? কৃষকদের এই ভয়ঙ্কর দুরবস্থা তাঁদের ভাবায় কি? কাঁদায় কি? যদি তা হত, তবে সমস্যাটাকে তাঁরা এমন উল্টো করে দেখতেন না। তা হলে তাঁরা বলতেন, সরকারের ভুল ঋণনীতির কারণে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিদের বড় অংশ ব্যাঙ্কঋণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সরকার এমন নীতি নিক, যাতে তাদের বেশির ভাগ এই ঋণ পেতে পারে। এ কথা বলতেন না যে, ঋণ মকুব করলে চাষিদের ঋণ শোধ করার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে অনাদায়ী ঋণের মোট পরিমাণ যেখানে প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি, সেখানে কৃষিতে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ মাত্র ১.২ লক্ষ কোটি টাকা। বাকি টাকাটা গায়েব করেছে মাত্র কয়েক জন কর্পোরেট পুঁজির মালিক মিলেই। এই সব কর্পোরেট পুঁজি মালিকদের অভ্যাসটা ভালো করার জন্য এই সব বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের কখনও মুখ খুলতে দেখা যায় না। সরকার প্রতি বছর কর্পোরেট ঋণ ছাড় দেয় লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। তা নিয়েও এঁদের কখনও হা-হুতাশ করতে দেখা যায় না। শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আশীর্বাদ ধন্য আদানির কাছে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণই প্রায় সমস্ত কৃষিঋণের সমান। তাঁর বাড়িতে ভোজ খেতে যেতে এই সব বিশেষজ্ঞদের উৎসাহের অভাব দেখা যায় না। শুধু ঋণভারে জর্জরিত কৃষক, উদয়াস্ত খেটে ন্যায্য দাম না পেয়ে তার যৎসামান্য ঋণ মকুব চাইলেই এদের গা জ্বালা করে।

সরকার যদি সত্যিই দেশের কোটি কোটি কৃষকের দুর্দশার কথা ভাবে, যদি সত্যিই তাদের লাখে লাখে আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করতে চায়,তবে ফড়ে-কালোবাজারি চক্রের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে ফসলের উৎপাদন খরচের অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ বেশি দামে সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে কৃষকদের থেকে সরাসরি সরকারকে ফসল কিনে নিতে হবে এবং তা ন্যায্য মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রি করতে হবে। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ব্যক্তিগত বাণিজ্য এবং মুনাফা লোটা বন্ধ করে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে। সার বীজ কীটনাশক উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানা বাতিল করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা চালু করতে হবে এবং সস্তা দরে কৃষকদের তা দিতে হবে। বর্তমান অবস্থায় সারা জীবন চাষ করেও একজন কৃষকের পরের বার চাষ করার মতো উদ্বৃত্ত থাকে না, তাকে ঋণের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই সম্পূর্ণ বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সব যদি না হয় তবে কোনও সরকারি বাগাড়ম্বরই কৃষকদের কাজে আসবে না। দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। তা সত্ত্বেও কোনও সরকার কখনও এই সমস্যাগুলির দিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। আচ্ছে দিনের স্লোগান তুলে এক সময় বাজার মাত করেছিল বিজেপি। সেই আচ্ছে দিন কৃষকরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। মধ্যপ্রদেশে সরকার কৃষকদের গুলিচালনার ঘটনার পরেও প্রতিদিন কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। আর সরকার তার সাফল্য তুলে ধরতে উৎসব করছে। মোদি সরকারের এই উৎসব যেন দেশের কৃষকদের বিদ্রূপ করছে। বিগত কংগ্রেস সরকার কৃষকদের দেওয়া কোনও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। নরেন্দ্র মোদি সরকারও তার দেওয়া কোনও প্রতিশ্রুতিই পালন করেনি। আবার এখন ঘোষণা করেছে, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় বাড়িয়ে দ্বিগুণ করবে। কিন্তু কোন জাদুকাঠির স্পর্শে এমন অভাবনীয় কাণ্ড তিনি ঘটাবেন তা বলেননি। অর্থাৎ আবার একটি মিথ্যাচার করছেন তিনি। আনন্দের কথা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়কদের মিথ্যাচার কৃষকরা ধরতে পারছেন, তাই মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে না ভুলে দাবি আদায়ের জন্য তাঁরা আন্দোলনের ময়দানে আসছেন। সরকার যদি এভাবে একটার পর একটা মিথ্যাচার করে চলে তবে কৃষক বিদ্রোহ বাড়তেই থাকবে এবং ছড়িয়ে পড়বে দেশের কোণায় কোণায়। কোনও সরকারি দমন-পীড়ন সে বিদ্রোহ দমন করতে পারবে না।